Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 59-66
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শর্মিলা দত্তের নির্বাচিত গল্প: চিন্তার নবায়ণ

রানা কংস বণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract

Sharmila Dutta is generally considered as one of the famous short story writers of Barak Valley, Assam. Her collection of short stories Nijhum Milongdisha (2011) comprises of fifteen extraordinary short stories. In the present article, I have tried to discuss the various aspects of four short stories of Sharmila Dutta namely "Dighir Jol Cholatchol", "Digonto khola Shatabdi O Kichu Kotha", "Nijhum Milongdisha" and "Feudal Chair" which have been selected from the above collection of short stories. In the selected short stories, Sharmila Dutta basically deals with the issues like the realites of life, the pain of partition, the dynamics of power politics etc.

Keywords: Reality, Partition, Power, Politics.

ঈশান বাংলা কোণে অবস্থানকারী শর্মিলা দত্ত (১৯৬৫) তার আপন প্রতিভাবলে গল্প সংসার জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পারিবারিক লৈখিক পরিবেশ থাকলেও গল্পকারের লেখন শৈলীর দক্ষতা সরাসরি প্রমাণ করে দেয় যে, তাঁর অন্তরদৃষ্টি কতটুকু প্রখর। তাঁর ভাবনাচিন্তার পরিধি অন্যদের থেকে ভিন্ন, ভিন্ন বলব সেই জন্যই যে, প্রাতিষ্ঠানিকতাকে স্বীকার করে, অস্বীকার করার যে নব কৌশল তা বর্তমান প্রজন্মকে ভাবতে বাধ্য করে। প্রাক্তন অবয়বকে সামনে রেখে তাকে চূড়মার করে উপদেশের ভাবভঙ্গিতে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাকে নবদিগন্তের দিকে ইশারা করা হলো চিন্তার নবায়ণের মূখ্য সূত্র। ইতিহাসের মর্মকথা, সমাজের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা করুণ আর্তনাদ, স্ব-অধিকার থেকে বঞ্চিত সাধারণ নর-নারী নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিদারুণ চেষ্টা বা গৃহকোণে আবদ্ধ সাধারণ গৃহবধূর ওপর নির্দিষ্ট নিয়মের বোঝা ও অত্যাচারের চূড়ান্ত মাত্রা শর্মিলা দত্তের গল্পে অপরূপ দক্ষতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর জন্ম দক্ষিণ আসামের করিমগঞ্জ শহরে। বাবার নাম দীপক নারায়ণ দত্ত ও মায়ের নাম পূরবী দত্ত। সভ্রান্ত পরিবারের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও লেখিকার রচনার মধ্যে দারিদ্র্যতাই হয়ে ওঠেছে প্রধান। তিনি দেশভাগ স্বচক্ষে দেখেননি কিন্তু আপনজনের মুখে শোনা দেশভাগের গল্প, আপন কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে যেভাবে ছিন্নমূল ও উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁর গল্পে স্থান করে নিয়েছে তা অতুলনীয়।

(১)

'নিঝুম মাইলংডিসা' (২০১১) এই গল্প গ্রন্থটি পনেরোটি অসামান্য গল্প নিয়ে সংগঠিত। এই গল্প সংকলনের গল্পগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি গল্প আলোচনা করব বলে স্থির করেছি। গল্পগুলি হলো: 'দিঘির জল, ছলাৎছল', 'দিগন্ত খোলা শতাব্দী ও কিছু কথা', 'নিঝুম মাইলংডিসা' ও 'ফিউডাল চেয়ার'। এই

গল্পগুলির মধ্যে আছে এমন এক বাচনভঙ্গি, যেখানে রয়েছে কম কথায় মন ছুঁয়ে যাওয়ার মত অসাধারণ মুন্সিয়ানা। যেখানে বোধ জেগে ওঠেছে স্মৃতিকে আধার করে। চরিত্রগুলোর মধ্যে বিপদ আছড়ে পড়ছে কিন্তু সেই বিপদের উত্তরণের পথও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। নবপ্রজন্ম অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্রোহ করেছে, ঠিক তেমনি আবার সামাজিক সমতা ফিরিয়ে আনতেও তৎপর হয়ে ওঠেছে।

'নিঝুম মাইলংডিসা' গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'দিঘির জল, ছলাৎছল'। নামটির মধ্যেই যেন এক রহস্যবোধ লুকিয়ে আছে। নিথর জলে ঢেউয়ের শব্দ অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতির মধ্যে অসহনীয় ভাবধারার উন্মেষ। গল্পকার শর্মিলা দত্ত তার কথন-বয়নের মধ্য দিয়ে গল্পের সূত্রপাতেই গ্রাম বাংলার শান্ত পরিবেশে দারিদ্র্যতার ভয়ংকর রূপের ছবি এঁকেছেন। যেখানে দেখা যায় কৈলাসের পরিবারকে দারিদ্র্যতা ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর সেই দারিদ্র্যতাই যে কৈলাসপতির জীবনের চরম দুর্ভোগের কারণ সেই কথাই কথককার আপন ভাব-ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন অপরূপ ভাবধারায়, তাই দেখি:

> "কৈলাসের ছানাপোনাগুলোর পেটের খিদে যেন চরচর করে বাড়ছে।
> সবই মা মনসার কৃপা।
> কৈলাসের ডাগর বউটার খিদেও যেন উথাল-পাতাল করে।" [১]

গল্পকার সমস্ত গল্প জুড়েই এক বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার কথা গেয়ে গেছেন। সুবল অসহায় তার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। এই মৃত্যুর পিছনে ছিল দারিদ্র্যতা। শত দুর্ভোগ সহ্য করেও গল্পকার কৈলাসের মধ্যে আতিথিয়তার গুণ দেখিয়েছেন। তাই তার কাছে ছেলেমেয়ের আবদারের থেকেও বড় ছিল মেহমানদের অভ্যর্থনা করা। কৈলাসের ছেলে মেয়ের কপালে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় হওয়াও দুর্বিষহ ছিল। কৈলাসপতির ঘরে যে আউশধানের ভাতের গন্ধ বেড়িয়েছিল তা নিজের জন্য নয়, অতিথিদের জন্য। তাইতো গল্পকার কৈলাসের হতভাগা সন্তানদের ভাগ্য দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন:

> "ছেলেপিলে গুলো ঝুলনের দুঃখে আর ভাতের গন্ধ নিতে নিতে ঘুমিয়েই পড়েছে আর সে তো উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে আছে। এ তো নিত্যদিনের ব্যাপার।"[২]

গল্পকার হাসান মিয়ার মত মাঝিকে গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, যে নাকি নাথবাবুও কৈলাস দু'জনকেই তার নৌকায় স্থান দিয়েছেন। তাঁর নৌকার মধ্যেই কৈলাস দুঃখী জনেদের ও গ্রামের দুঃখ দুর্দশা উন্নয়নের প্রার্থনা করেছেন নাথবাবুর কাছে। তখনই হাসান মিয়া গেয়ে ওঠে:

> "বেইল থাকতে দমের খবর সবে লওরে থুরা
> দম সাধিয়ে সাধুপিরে শূন্যে দেরে উড়া।
> কীরে হই হই হেইয়া...।" [৩]

হাসান মিয়ার এই গানটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। কথককার এই গানের মধ্য দিয়ে জগৎ সংসারের আসল সত্যটি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। কারণ সময়ের সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়েই আসল সুযোগ সন্ধান করা যায়। লেখক হুসেন মিয়াকে শুধুমাত্র মাঝি রূপে নয়, সময়ের দূতক, বাঁচার প্রেরণার মূল কর্ণধার, নবচিন্তার রূপায়ণ রূপে চিত্রিত করেছেন।

আমরা জানি স্মৃতি মানুষকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে পুরনো ব্যাথা ও কষ্টকে উপেক্ষা করে মানুষ বাঁচার নতুন পথ খুঁজে পায়। হুসেন মিয়া কৈলাসকে সেই জমিদার

বাড়িতে নিয়ে গেছে যেখানে অজস্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে। জমিদার বাড়ির বর্ণনার মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট হয় যে, সেই বাড়ির সাথে কিভাবে কচি বউটির সম্পর্ক ছিল? কৈলাস জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য, ভাবধারা ও ভালোবাসার সঙ্গে কাটাখালের শীতল পাটীর তুলনা করেছেন। বহমান সময়ে দিঘির উচ্ছ্বাসবিহীন কোলাহলই যে জমিদার বাড়ির স্থবিরতার প্রতীক তা আর আমাদের বোঝতে বাকি থাকে না। যে দিঘির পাড়ে জমিদার বাড়ির বউ-ঝিয়েরা স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করতে পারত, কিন্তু গল্পকার সে জায়গাটি জনশূন্য করে দিয়েছেন। তাই সেই অদ্ভুত উঠানে যখন দুই বাবু থাকতে চেয়েছিলেন তখন কৈলাস বলেছিল,

> ‘বাবুরা চলেন আমার সনে। গোর লয়ে কইতাছি কাইল প্রভাতে আসেন। এহানে মা
> চাকুরুণের বাস। তেনারে শোয়াস্তি দ্যান।’ [৪]

কৈলাসের কথা শোনে তারা চলে গিয়েছিল।

কথককার জমিদার বাড়ির কচি বউকে অলৌকিক দৃশ্যপটে আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন, কারণ তার পায়ের জলের শব্দ কোলাহলের নিমিত্ত মাত্র। এই কোলাহল বহমান স্রোতের সৃষ্টি নয়, তা হলো বদ্ধ জলের। যদিও এই ছলাৎছল শব্দের জোড় বেশি কিন্তু তা স্থায়ী নয়। কৈলাস মিথ্যে আশাকে আশ্রয় করে নতুন আশাকে জাগ্রত করতে চায়, কিন্তু সেই আশায় কোকিলের নব সুরের মূর্চ্ছনা আর পাওয়া যায় না, শোনা যায় শুধু আর্তনাদ। গল্পকার যেহেতু হাসান মিয়াকে জীবন দ্রষ্টা রূপে চিত্রিত করেছেন তাই তার মধ্যে দিয়ে গল্পকার উপদেশের যেমন সূত্র নিক্ষেপ করেছেন ঠিক তেমনি উত্তরণেরও অসাধারণ পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই তো গল্পের শেষ করেছেন গল্পকার হাসান মিয়ার গানের মধ্য দিয়ে; যার মধ্যে রয়েছে, অসাধারণ তাৎপর্যমূলক ভাবধারা-

> ‘বেইল থাকতে দমের খবর সবে লওরে থুরা
> দম সাধিয়ে সাধুপিরে শূন্যে দেরে উড়া।
> কীরে হই হই হেইয়া।’ [৫]

(২)

কথককার শর্মিলা দত্ত ‘দিগন্ত খোলা শতাব্দী ও কিছু কথা’ এই গল্পটির মধ্যে এক মুক্ততার আভাস দিয়েছেন। নিজের মনের সঞ্চিত ধ্যান ধারণার পূর্ণ ব্যাপ্তিতে লাগামহীন ভাবে আড্ডার ছলে সমাজের আসল রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। যে আড্ডা সমবয়সীদের, যে আড্ডায় রসদ জোগায় সিঙারা ও চাটনী, যেখানে আছে হই-চই। নিজেকে নিজের মত আবিষ্কার করার পরিবেশ, অন্য বন্ধুদের সাথে নিজ ব্যক্তি বোধের সামঞ্জস্য আছে কিনা তা তলিয়ে দেখার অভিপ্রায়, যেখানে আছে অনুনয়-বিনয়, তবু নিজ মতবাদকে স্থির রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

গল্পের শুরুই হয় ঝিন্নি ও শাখার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। তারা জীবনরেখার মধ্যে সরলীকরণকেই প্রাধান্য দেয়, তাই তারা খোলা-মেলা ভাবে ব্যক্তিবোধ ও সমাজবোধকে একাকার করে বাঁচতে চায়। তাদের আগ্রহবোধের আকাঙ্ক্ষা সেই রংপুরের বাঁধের রাস্তায় বসবাস করা এক অন্য সংসারকে দেখতে পেয়েছিল, যে সংসারে নেই নিজস্ব ভিটা-মাটি, না আছে দু’বেলা অন্ন সংস্থানের সঠিক ব্যবস্থা, আছে শুধু দুঃখ-কষ্ট আর অসহায়তার বিমর্ষ জ্বালা যন্ত্রণা। তাই শাখা ও ঝিন্নির বোধে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

ছাত্রবয়সে অনেক কিছু জানার-বোঝার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। তখন তাদের মধ্যে জীবনানন্দের ভাষায় বললে ‘এক অজানা বোধ কাজ করে’। তারা যেমন এই বয়সে মাত্রাধিক আবেগ-প্রবণ হয় ঠিক তেমনি ‘পাথর বাঁধা’ ভাঙতে ও দ্বিধাবোধ করে না। তাই তো গল্পকার শাখা ও ঝিল্লিকে দিয়ে সেই বয়স যা করতে ভালোবাসে তাই করিয়েছিলেন যেমন স্যারের বাড়ি ফাঁকি দিয়ে রংপুরের ভরা নদী দেখতে যাওয়া।

লেখক শর্মিলা দত্ত শাখাকে ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করেছেন। যার মধ্যে বাস্তবতাবাদ প্রচণ্ড, প্রতিবাদ করার স্পৃহা দুদর্মনীয়। সে ভক্তিবাদীতে বিশ্বাসী না, সে কর্মযোগে বিশ্বাসী। সে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে আগ্রহী, মানুষকে জানতে আগ্রহী। তাই সমাজের কঠোর, ঘৃণ্য, সাধারণ মানুষের লোমহর্ষক অতি চূড়ান্ত বাস্তবকে তুলে ধরেছে। তাই গল্পে দেখি:

> ‘শিলাজিৎ কে জিজ্ঞেস কর না তরুণ ওর তো একটা সৈনিক কলম আছে। সেই কলম দিয়ে চাকরি পাবে? ডিগ্রি তো আমরা সবাই নিচ্ছি। চাকরি পাব? চাকরি এখন আর পাওয়া যায় না। কেনা বেচা করতে হয়। কিনব আমরা ট্যাকার জোর থাকলে আর বেচবে নেতারা যারা কেউ কেউ হয়তো কলেজের গণ্ডিও পেরোয়নি। আমাদের চাকরির জন্য দারুণ নম্বর সহ ডিগ্রি চাই তাদের চাকরির জন্য ধর্ষণ, খুন, ঘুষ খাওয়া এসব হল কোয়ালিফিকেশন। তাদের লজ্জা নেই কিন্তু আমাদের লজ্জা থাকতে হবে; আমাদের চাকরি করে সংসারের জোয়াল টানতে হবে আর আমাদের পয়সায় শালারা রোয়াব দেখাবে।’ [৬]

এ ধরনের অসামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কথককার। স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ না করলে আমাদের সমাজ নতুনভাবে জাগবে না, আমাদের প্রাপ্য কখনও আমরা আয়ত্ত করতে পারব না। তাই লেখিকা শাখাকে নবচিন্তার ধারক বাহক রূপে চিত্রিত করেছেন।

দুঃখের অন্তরালে সুখের বাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে গল্পকার সেই সুখকেই জীবন ধারনের জন্যই আশ্রয় করে নিতে চেয়েছেন। সমবয়সীদের মধ্যে ভাবনাচিন্তার তফাৎ যে বিস্তর থাকে তার কথা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে শিলাজিৎ যখন বলে, সেই বাঁধের ওপর জীবনধারণ করা মানুষদের ব্যাপারে-

> ‘কতগুলো লোক যন্ত্রনায় আছে। বাঁধের ওপর যাচ্ছে-হাগচ্ছে এটা দেখার ব্যাপার হল ঝিন্নি?’ [৭]

এ প্রশ্নের উত্তরে শাখার উত্তরটি প্রণিধান যোগ্য:

> ‘তুই কেবল দুঃখ দেখে এসেছিস। আর ঝিন্নি আর আমি দেখে শিখে এসেছি- দুঃখেও কী করে ভালো থাকা যায়।’ [৮]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে দেশ দুর্বার স্রোতে এগিয়ে চলেছে কিন্তু নারীরা এখন বিপন্ন অসহায়, ভোগ্য দ্রব্য বা পণ্য দ্রব্য রূপেই সমাজে পরিচিত। মেয়েদের পড়াশোনা করানো হয় নিজের পায়ে দাঁড়া করানোর জন্য নয় মূলত, বলা বাহুল্য মেয়েরা যেন উপযুক্ত বর পায় তার জন্যই। না হলে কি দিঘি এভাবে বলতে পারত যে-

> ‘পাত্রীর বাজারে দাম সর্বস্ব হওয়ার জন্যই কি পড়াশোনা?” [৯]

কারণ কথককার একুশ শতকের রক্তমাংসে গড়া সমাজ-বাস্তবতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক নারী। তাঁর মূল্যবোধ ভাবাদর্শের প্রসূতিই তো ‘সাধারণ’ শব্দের অসাধারণ ব্যাখ্যা। তাই তিনি দিঘির মত চরিত্র সৃষ্টি

করেছেন যার মধ্যে রয়েছে ভালো চাকরি পাওয়ার মত সমস্ত গুণ, কিন্তু স্বজন-পোষণ নীতির অনুকরণ কারীরা টাকার শক্ত বাঁধনের মাধ্যমে দিঘির মত যোগ্যতা সম্পন্নদের সদাই বঞ্চিত রাখে। সমাজের এই কঠোর বাস্তবকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখিকা শর্মিলা দত্ত। দিঘির মনে অফুরন্ত প্রশ্ন জেগে উঠেছে সেই অপশাসন ও কাঠামোগত অসামাজিক পরিবেশের উদ্দেশ্যে। দিঘির অনুভব যেন স্বয়ং কথাশিল্পী শর্মিলা দত্তের, গল্পের মধ্যে এমন এক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে অস্তিত্বের খোঁজে সবাই অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, নতুন আশাও নতুনভাবে ওঁকি দিতে ভয় পায়। তাই এই পাঠ পড়তে পড়তে মনে হয় সেটি আমাদের জন্যই লেখা, তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছেন যে, এই হলো সমাজ কাঠামো, যার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের দাবানল।

(৩)

নবম্লান আশার আলো নিয়ে 'নিঝুম মাইলংডিসা' গল্প শুরু করেছেন গল্পকার যদুনাথের চোঁখ দিয়ে। সে সমতল ছেড়ে ছোটবেলাই বাবার হাত ধরে স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করেছিলেন। আর সেই স্টেশনই ছিল তাঁর পৃথিবী। পাহাড়ের বুকে জেগে থাকা একটি ঝকঝকে স্টেশন যার নাম, 'মাইলংডিসা'। গল্পটির পরিধি এত বিস্তৃত নয়, গল্পটি ছোট ছোট চারটি পর্বে বিভক্ত।

যদুনাথের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। যতটুকু সম্পত্তি ছিল তা সম্পূর্ণই মায়ের দেওয়া। মায়ের সমস্ত 'খুচরো গয়নার টাকায়' চাকা দেওয়া চা-স্টল বানিয়ে দিয়েছিল তার বাবা যজ্ঞেশ্বর দাসকে। স্বামী-স্ত্রীর ভাবনাবোধ ও সহমর্মিতাই দাম্পত্য জীবনের সুখের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রীর মধ্যেও জীবন সংগ্রামের বিপরীতে রুখে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পাহাড় প্রদেশে যদুনাথ নিজেকে খাপ খাওয়াতে অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। ছোটবেলায় যাদের সাথে খেলা করেছে, যেমন নন্দ, বিভূতি ও জীবন তাঁদের জন্য সদাই যদুনাথের মন আকুলি-বিকুলি করে। গল্পকার দেশভাগের কথাও এ গল্পে একটু ভিন্ন আদলে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখানে শাহ আব্দুল করিমের যে গানটি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক বলে বোধ হয় সে গানটি হলো:

'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম'

বলাবাহুল্য লেখক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার গল্পে নিছক পরিকল্পনা সহকারে ফুটে উঠেছে দারিদ্র্যতা, অসহায়তা ও স্বজন বিচ্ছেদের ঘটনা। এই গল্প সংকলনের অধিকাংশ রচনার মধ্যেই মৃত্যু ভাবনার পাশাপাশি জীবনকে খোঁজের তাগিদও পরিলক্ষিত হয়।

কথককার অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় পাহাড়ি জনজাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন যা লৌমহর্ষক। রাজনীতির ঘোর প্যাঁচে সাধারণ ঘটনাও অসাধারণ রূপ নেয়। সত্য কথন-কখন মিথ্যার রূপ নিয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় যা হয়ে ছিল মাইলংডিসায়ও। রাজনীতির কূটকৌশল কীভাবে মাইলংডিসায় জনজাতিদের জীবনে দুর্ভোগ নিয়ে এসেছিল তাঁর একটি কথাই এখানে বর্ণনা করেছেন লেখক:

> '২০০৩ সাল; ৫ জুলাই। মাইলংডিসার এক ডিমাসা যা জলজ্যান্ত পুড়ে যায় তেইশটি পাহাড়ি ঘর। নিরিবিলি বাস করা পাহাড়ি মানুষ রুষে ওঠে।
> রাজতান্ত্রিকরা নাম দেয় 'জাতিদাঙ্গা'। জাতিদাঙ্গাঁর আড়ালে পোক্ত হয় রাজতন্ত্রের কৌশলগত বিন্যাস।' [১০]

গাওবুড়ার কথা গল্পকার উল্লেখ করেছেন, যার কথায় স্টেশনের হাসির মাত্রা ছড়িয়ে পড়ত। সে সহজ সরল ভাষায় সরল জীবনের কথা বলত। কিন্তু সুতানলির ছোবলে সেই অঞ্চলে আর যদুনাথের চা-স্টলের বাতি উজ্জ্বল দেখায় না, বাতি এখন টিনটিন করছিল। উচ্চবিত্ত লোকেরা বিশেষ করে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে যারা টাকা-পয়সা বেশি রোজগার করতে চায়, তাদের নির্মম হৃদয় আমাদের কাছে ধরা দেয় তারা সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। তাই দেখি, এই ব্রিটিশ মেধার কৌশলী পাহাড় লাইন দিয়ে লামডিং যাওয়ার সময় মাইলংডিসায় বসবাসকারী ডিমাসা জনজাতিদের ব্যবহার করেই বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় করেছেন। তাদের আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে আছে ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের ভাড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে যে বাঁক নিয়েছে সে বাঁক তাদের ভাষা কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে তাদের স্বাধীনতা।

লেখিকা শর্মিলা দত্ত তার জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু স্বল্পবয়নে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'নিঝুম মাইলংডিসায়'। গল্পের শেষে যেন গল্পকার হতাশার বাণী শুনিয়েছেন। যেখানে রেল শঙ্খের ধ্বনি আর শুনা যায় নি। সেখানে ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশনের চা-স্টলের যদুপতি ও নন্দুর মরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছিল। লেখিকা সেই পাহাড়ি স্টেশন সম্পর্কে একটি বাক্য বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা হলো:

'কোথাও আর মঙ্গল নেই।'[১১]

লেখিকা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে এই অমঙ্গল শুধু পাহাড়ি স্টেশনের না, এই অমঙ্গল সেখানে বসবাস করা প্রত্যেকটি ঘরের, জাতি গোষ্টীর। সেই পাহাড়ি এলাকা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে, তাই তিনি গল্প শেষ করেছেন এভাবে-

'মাইলংডিসা নিথর পড়ে আছে।'[১২]

'ফিউডাল চেয়ার' গল্পটির মধ্যে লেখক শর্মিলা দত্তের এক অসাধারণ ভাবধারা কাজ করেছে। আভিজাত্যের দাপট এবং অহংকারবোধ মানবজীবনে চরম দুর্দশা ডেকে আনে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐতিহ্যাশ্রয়ী অধিকারকে অতি সহজে কেউ কাউকে দিতে চায়না, না দেওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেই অধিকার যদি নতুন অহংকারের জন্ম দেয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাতে যদি আবার ক্ষমতার লোভ লালসার মাত্রাও বৃদ্ধি পায় তখন তা ব্যক্তিও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গল্পটির নাম 'ফিউডাল চেয়ার' অর্থাৎ একটা গদির কথা আছে, যে গদিতে আছে আভিজাত্যের ছাপ, মহাশূন্যতার মধ্যেও অহংকারের পদধ্বনি, সেই গদির ক্ষমতাকে ধরে রাখার আকুল প্রয়াস। তাইতো লেখিকা তার লেখন শৈলীতে সেই চেয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> 'অঞ্জন একটা চেয়ার দেখতে পেল- শূন্যে সোজা হয়ে রয়েছে? দু-দিকের হাতলে দড়ি বাঁধা কিন্তু দড়ির শেষ মাথা অবয়বহীন- যেন এক ধোঁয়াশা, কোথাও যেন মিশে যাওয়া।'[১৩]

তিনি এই চেয়ারের অস্তিত্বকে ফেবিকলের আঁঠার সাথে তুলনা করেছেন। সেই চেয়ারের পরমায়ুকে তিনি আরশোলার আয়ুর সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাই তো তিনি বলেছেন,

> 'অনেকটা যেন আরশোয়ালার মতো প্রত্নপতঙ্গের মতো। অঞ্জন জানে আরশোলা নাকি বহুবছর বাঁচে- বহু কষ্টেও ওরা বিশাল আয়ুধারী। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন কীট।'[১৪]

এই শোষণ শাসনের পদ্ধতি যে পৃথিবীর ইতিহাসের মজ্জাগত সে কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন।

সেই চেয়ারের প্রতি অঞ্জনের অদম্য আগ্রহ। অঞ্জন চেয়ারের পালাবদল দেখেছে কাজের ক্ষেত্রে। সে দেখেছে চেয়ার নির্দেশ দিতে শেখায়, তাইতো দেখি চেয়ার ও তর্জনীর যৌথ ক্ষমতা নিমিষেই অনেক কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে। নতুন ভাবনা চিন্তা ও প্রগতির সূত্রধার হিসেবে তৃণার আবির্ভাব গল্পে। পুরোনো গুদাম ঘরের এক কোণে অবহেলায় পড়ে থাকা চেয়ারকে সে আবিষ্কার করেছিল। যে চেয়ার মৃত অবস্থায় পড়েছিল। তাকে সজীব করতে তৎপর হয়ে উঠল। কারণ এই চেয়ারের মধ্যে ইতিহাসের সত্য লুকিয়ে আছে। আবার সে ঠাকুমার মেহগনি কাঠের খাটের কথা বলেছে, সেটা তার ভীষণ পছন্দের। লেখিকা সেই দামী কাঠের খাটের কথা বলেছেন, যে খাটে ঠাকুমার অধিকার ছিল। কিন্তু ঠাকুরমার সাথে তৃণার মায়ের যে সুসম্পর্ক ছিল না তা আমাদের আর বোঝাতে কষ্ট হয় না, যখন দেখি তৃণা বলে-

‘তুমি কি ঠাকুমাকে ভালোবাস না মা?
ঠিক এই কথাটাই তুই তোর ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করে আয় তো...’ [১৫]

তৃণাও জানতো যে তার ঠাকুমার মধ্যে কোন স্নেহের অভাব ছিল না। মায়া ছিল কিন্তু চোরা স্রোতের মতো। কিন্তু ঠাকুমার বাইরের খোলসটা অনেক শক্ত। তাইতো লেখিকা সেই শক্ত আবরণকে স্পষ্ট করার জন্য মেহগনি কাঠের উল্লেখ করেছেন। বংশ পরম্পরাগত কোন শাসনের ছাপ পরবর্তী প্রজন্ম বা যে শাসনের উপযোগী তার মধ্যে বিরাজ করা তা অস্বাভাবিক নয়। তাই তো তৃণা বলে যে,

‘দাদু মারা যাবার পরও কি ভীষণভাবে তিনি ছুড়ি নিয়ে ঠাকুমার মধ্যে বেঁচে ছিলেন।’[১৬]

সময়ের স্রোতে সবকিছু পাল্টে যায়। মানুষের পছন্দ ও ভালোবাসা কোথায় যেন তলিয়ে যায়। তাইতো ঠাকুমার মেহগনি জমিদারের প্রতাপ বা গোদামঘরের আসবাব পত্রের মুগ্ধতা সম্পর্কে ভাববার আর অবকাশ নেই। সংসার জালে অংশুমানকে নিয়ে ঘর সংসার করার ক্ষেত্রে যে দখলদারির বদ্ধতা তৃণাকে অসহায় করে তুলেছিল তারই চূড়ান্ত বাস্তবের অভিজ্ঞতা লেখিকা এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন-

‘আমি না থাকলে তুমি আরেকজন আনবে দু’বেলা পেট ভরার জন্য। কিন্তু তাকে হয় বেতন দিতে হবে না হয় দোজবর বলে তোমার তথাকথিত সম্মান খোয়াতে হবে।’[১৭]

পারিবারিক কলহ ও অশান্তিই হয়তো তৃণাকে তার সন্তানদের নিয়ে একা বাঁচতে শিখিয়েছে। তাই তৃণা তার ছেলের মধ্যে সেই ছুরি ঘুরানোর মনোভাব দেখতে চাননি। শ্বশুর থেকে থেকে যে উত্তরাধিকার সূত্রে অংশুমান চেয়ার দখল করে বসেছিল, আর সেই চেয়ারই হয়তো তার পরম্পরাগত গুণগুলি অংশুমানের মধ্যে প্রবেশ করতে শিখিয়েছিল। তৃণার মনে তার মায়ের কথা মনে পড়ে, কেন মা বাবার অমতে ঠাকুমার মেহগনি খাটটি সামসুলদাকে দিয়ে ভাঙিয়েছিলেন? এই খাটটি ভাঙার সময় সামসুলদার মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু মায়ের মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ হয়নি, কারণ এই ভাঙার মধ্যেই রয়েছিল অদৃশ্য প্রভুত্বে বিনাশ ও নবদিনের সূচনা।

অংশুমানের কেদারখানাও দামী কাঠের তৈরি। তাতেও ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য। এই কেদারখানা কবে কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা জানার কেউ আগ্রহ বোধ করে না, সবার আগ্রহ শুধু এই চেয়ারের ক্ষমতা ব্যবহারের দিকে। সমস্ত পৃথিবীতে যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসায় ঘুনে ধরেছে ঠিক তেমনি কেদারখানায় বসার জায়গায়ও কীটে ধরে গেছে। কথককার আপন ভঙ্গিতে বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন এভাবে-

‘প্রভুত্বের আসনেই যত গণ্ডগোল। পৃথিবী খোকলা হয়ে যাচ্ছে আসনের গুণাগুণে।’[১৮]

এখানেই লেখকের মানস অভিজ্ঞতা বিশ্ববোধের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। গল্পের শেষাংশে মা ছেলের মধ্যে দিয়ে সেই কেদারাকে অস্বীকার করার প্রবণতাই লক্ষ করা যায়।

(৫)

কথককার শর্মিলা দত্তের 'নিঝুম মাইলংডিসা' গল্প সংকলনে যে গল্পগুলি রয়েছে তার প্রত্যেকটি গল্পই পাঠক হৃদয়ের গভীর অতলে স্পর্শ করেছে। তাই দেখা যায়, গল্পগুলির মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলিও প্রধান হয়ে ধরা দিয়েছে। গল্পকারের প্রত্যেকটি গল্পের নামকরণের মধ্যেই যেন বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে লেখিকা শর্মিলা দত্তের 'নিঝুম মাইলংডিসা' গল্প সংকলনের নির্বাচিত চারটি গল্পের মধ্যে লেখিকার ব্যক্তিগত অনুভূতি কীভাবে ব্যাষ্টিগত হয়ে উঠল, কীভাবে তার জীবন ভাবনাবোধ পৃথক হৃদয়ের ভাবনাবোধের সঙ্গে একাত্মিকরণ করল আর নিরাশার আড়ালেও যে আশার বাণী লুকিয়ে থাকে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র:

১. দত্ত শর্মিলা, 'নিঝুম মাইলংডিসা', প্রতিভাস, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১।
২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৩।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা:১৬।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৮।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩১।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯০।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯০।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৩।
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৩।
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪।